প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

তোমারি নাম বলব নানা ছলে : তন্নিষ্ঠ পাঠ

ড. গৌতম কুমার নাগ

Abstract

*The aim of the present paper is to explore the linguistic aspects of a well-known song of Tagore: tomari nam balbo nana chhale. The song pivots on the theme of **nām** (name). Through an in depth study of the salient lexical, morpho-syntactic and semantic features of this song we have attempted to demonstrate how the theme had been developed. Our second objective is to discern the influence of tradition on this song. We have ended up the discussion with a brief comparative study of a few songs of Tagore which have been composed on the same theme.*

নামে কি এসে যায়? What's there in a name? --- নামের প্রসঙ্গ উঠলেই প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত জুলিয়েটের এই উক্তি বা তার বঙ্গানুবাদটির উদ্বৃতি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে নামের গুরুত্বহীনতা প্রমাণ করতে শেকসপীয়রের বঙ্গানুবাদ করাটা অপরিহার্য নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যেও আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাই। নাম সম্বন্ধে একই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির এই উক্তিতে :

শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চঞ্চল'
তা ব'লে ক জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।

তবে নাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে। তেমনই একটি গান আমরা আলোচনার জন্য আমরা নির্বাচন করেছিঃ তোমারি নাম বলব নানা ছলে। বস্তুতঃ পূজাপর্যায়ের সুপরিচিত এই গানটিকে একটি "নামপ্রধান" গানরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

এই নিবন্ধটি উল্লিখিত রবীন্দ্রসঙ্গীতটির একটি অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ। এই গানের সাঙ্গীতিক রূপটি আমাদের আলোচ্য নয়, এর কাব্যরূপের সৌন্দর্য আস্বাদন করাই অবয়বের বিভিন্ন গঠক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করব। নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা এই গানে ঐতিহ্যের প্রভাব নির্ণয় করার চেষ্টা করব। এরপর অনুরূপ বিষয়বস্তু উপর রচিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানগুলির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করব।

তোমারি নাম বলব নানা ছলে,
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।।
বলব কিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,

বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম
সে বলে।। (পূজা / ১০৫)

এই গানটির যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল "বলা" ক্রিয়াটির পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ। আটকলির এই গানটিতে এই ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে সাতবার --- প্রথম অংশের চারটি কলিতে ছয়বার (ভবিষ্যৎ রূপ "বলব") এবং শেষ কলিতে একবার (সাধারণ বর্তমান রূপ "বলে")। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম কলিতে এই ক্রিয়াটি একবারও ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু পঞ্চম ও সপ্তম কলিতে তার পরিবর্তে এসেছে একটি সমধর্মী ক্রিয়া "ডাকা" (দুটি কলিতে যথাক্রমে এর ভবিষ্যৎরূপ "ডাকব" ও সাধারণ বর্তমান "ডাকে" ব্যবহৃত হয়েছে)।"বলা" বা "ডাকা" ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত দুটিমাত্র ক্রিয়া সমগ্র গানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে : পঞ্চম কলিতে "পূরবে" ও শেষ কলিতে "পারে")। এরমধ্যে "পারে" ক্রিয়াটি "বলা" ক্রিয়াটির অসমাপিকা রূপ "বলতে"র সঙ্গে যুক্ত : অর্থাৎ এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমী। সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখা যাছে এই গানে "বলা" ক্রিয়ারই প্রাধান্য।

এরপর বিশেষ্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত বিশেষ্যপদ হল "নাম"। গানের শুরু "নাম" দিয়ে (তোমারি নাম বলব) শেষও হয়েছে "নাম" দিয়ে (মায়ের নাম সে বলে)। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কলিতে অনুপস্থিতির পর পঞ্চম, সপ্তম ও শেষ কলিতে "নাম" বিশেষ্যটির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কলিতে অনুপস্থিত থাকলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "বলব" ক্রিয়ার কর্ম এই শব্দটি উহ্য রয়েছে। এছাড়া একাধিকবার ব্যবহৃত একমাত্র বিশেষ্য হল "ডাক" (পঞ্চম ও ষষ্ঠ কলিতে)। সর্বনামের পর্যালোচনায় দেখা যায় "আমি" ও "তুমি" এই গানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গানটি গাইবার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় কলিতে "আমি" শব্দটি উচ্চারিত হয়, কিন্তু কাব্যরূপে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। "তুমি" শব্দটি কোথায় প্রযুক্ত হয় নি। এই গানে "তুমি"র উপস্থিতি একমাত্র "তোমার নাম"-এ। উত্তমপুরুষের অস্তিত্ব অনুভূত হয় ক্রিয়ারূপে ("বলব" "ডাকব")। এছাড়াও "আমি"র উপস্থিতি অনুভব করা যায় ষষ্ঠ কলিতে "মোর ডাক"-এ। অর্থাৎ এই গানে "আমি-তুমি"' চলে গেছে অন্তরালে; রয়েছে শুধু তোমার "নাম" ও আমার "ডাক"। অন্যভাবে বললে এই গানে একটিই মাত্র ক্রিয়া (action) ; তা হল "নাম বলা" বা "নাম ডাকা"। এই প্রসঙ্গে আর একটি গান মনে আসে :

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে ***তোমারি নাম*** *সকল তারার মাঝে।।*

.....

অমনি করে আমার এ হৃদয়ে ***তোমার নামে*** *হোক-না* ***নামময়,***

..... (পূজা / ৩৫০)

প্রথম পাঠেই দেখা যায় আমাদের আলোচ্য গানটির গঠন ও শব্দচয়নের মধ্যে সেই নামময়তার প্রতিবিম্ব।

প্রথমে আমরা স্থায়ী ও অন্তরা অংশের বিশ্লেষণ করব। আমরা আগেই দেখেছি এই অংশে একমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া "বলা" (ভবিষ্যৎ রূপ "বলব")। এই অংশের প্রতিটি কলিতে বর্ণনীয় বিষয় হল সেই "বলা"র প্রকৃতি কিভাবে বলব, কেমন করে বলব।

প্রথম কলি : নানা ছলে
দ্বিতীয় কলি : একা বসে

তৃতীয় ও চতুর্থ কলির গঠনের মধ্যে প্রতিসাম্যটি লক্ষ্যণীয় : তৃতীয় কলি : বলব + নঞর্থক শব্দগুচ্ছ / বলব + নঞর্থক শব্দগুচ্ছ

চতুর্থ কলি : বলব + বলার মাধ্যমনির্দেশক শব্দগুচ্ছ / বলব + বলার মাধ্যমনির্দেশক শব্দগুচ্ছ

অন্যভাবে বলতে গেলে তৃতীয় কলিতে বলা হয়েছে "কিভাবে বলব না", চতুর্থ কলিতে "কিভাবে বলব"। "কিভাবে বলব" --- তার অতিরিক্ত যা বলা হয়েছে তা হল :

প্রথম কলি : কি বলব (ক্রিয়ার কর্ম : তোমার নাম)

দ্বিতীয় কলি : কোথায় বলব (ক্রিয়ানুষ্ঠানের স্থান : আপন মনের ছায়াতলে)

প্রথমে আমরা বিশ্লেষণ করব দ্বিতীয় কলিটি। "একা বসে" এবং "আপনমনের ছায়াতলে" --- এই একত্রিত শব্দগুচ্ছের মধ্যে নিহিত রয়েছে ঈশ্বরসাধনাবিষয়ক রবীন্দ্রভাবনার একটি রূপ। এইস্থানে ভক্তকবি "নাম'কে অবলম্বন করে তাঁর নিভৃত প্রাণের দেবতার আরাধনায় ব্রত; ঈশ্বরকে তিনি পেতে চান নিবিড় নির্জনতায় হৃদয়ের গহনে। এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে অন্যান্য আরও অনেক গানে। যেমন :

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই
থাকি।
.....
কাজ কী আমার মন্দিরেতে
আনাগোনায়
পাতব আসন আপন মনের
একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।।
(পূজা / ১৩২)

অথবা

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ
নয়নে নয়নে।
.....
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোকলোকান্তরে
যুগযুগান্তর ---
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই
ভুবনে।। (পূজা / ৪৮৭)

আবার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় অন্যান্য বহু গানে। ঈশ্বরকে পেতে হলে সংসারত্যাগ করে, সমস্ত জাগরিত বন্ধন ছিন্ন করে গহন অরণ্যে বা নির্জন গিরিগুহায় তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে হবে --- এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ বহু গানেই দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে পেতে চেয়েছেন এই মানবসংসারের মধ্যে : প্রতিদিনের হাসিকান্না, আনন্দবেদনার মধ্যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, জীবনের সব দ্বন্দ্বসংঘাত, সব জটিলতার মাঝখানে। যে রবীন্দ্রনাথ নামের মধ্য দিয়ে পূজা নিবেদনের জন্য স্থাননির্বাচন করেন "আপন মনের ছায়াতল" খোঁজেন নির্জন একাকীত্ব, তিনিই আবার ঘোষণা করেন :

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে মারও।।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে ---
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন
আমারও।। (পূজা/৩৬৩)

অথবা

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমার হৃদয়ে বরিবহে।।
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে ---
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার
করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমার হৃদয়ে
বরিব হে।। (পূজা / ৩৬৭)

অথবা

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো!
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।।
.....
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি সেই
তো আমার তুমি।। (পূজা / ৩৫৪)

একই প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে বিপরীত মেরুতে করিব এই অবস্থান রবীন্দ্রচিন্তার জগতের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যেরই পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রনাথ কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের বন্ধনে নিজের ভাবনাকে আবদ্ধ রাখেন নি।

রবীন্দ্রনাথের এই আপাত অসঙ্গতি বা স্ববিরোধিতা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমর বাণীকেই স্মরণ করিয়ে দেয় : "যত মত তত পথ"।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। "আপন মনের ছায়াতলে" --- পূজানিবেদনের এই স্থাননির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক গানেই এই স্থানটি হল মনের কোণ। এক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে এক মনোরম ছায়াময় পটভূমি --- যার মধ্যে রয়েছে প্রখর দাবদাহ থেকে সুরক্ষার আশ্বাস। এমন আবহ এই গানের মূল ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা দেখেছি এই গানে কোথাও কৃচ্ছসাধনার কথা নেই, দুঃখযন্ত্রণার দহনে চিত্তশুদ্ধির চিত্র নেই; আছে শুধু প্রিয়নাম বলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সেই নাম উচ্চারণের মধ্যে যে নিবিড় প্রশান্তি আছে স্নিগ্ধ ছায়ার পটভূমি তারই উপযোগী।

লক্ষ্যণীয় এই মিলনের স্থান আলোয় আলোকময় নয়; প্রাণের দেবতাকে আবাহনের জন্য কবি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান নির্বাচন করেছেন। এখানে আঁধার তার প্রথাগত তাৎপর্য বহন করেছে না। তত্ত্বজ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতীক যে আলো --- যা সত্যের খণ্ডিতরূপকে উন্মোচিত করে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে শুধু দুস্তর ব্যবধান রচনা করে --- এই অন্ধকার তারই বিপরীত। এই অন্ধকার বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণশক্তির উন্মেষের পূর্ববর্তী স্তরটির প্রতিচ্ছবি, এই অন্ধকার শিশুহৃদয়ের প্রতীক --- যার চালিকাশক্তি শুধুমাত্র সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব --- যেমন ছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পূর্বে নন্দনকাননবাসী আদমের হৃদয়। এই অন্ধকারের মধ্যেই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যবর্তী সমস্ত ব্যবধান অবলুপ্ত হয়ে যায়, দুজনে একাত্মা হয়ে যায় --- যে একাত্মতা তত্ত্বজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো আলোয় অন্ধ জ্ঞানী পণ্ডিতের কাছে চির অধরা থেকে যায়। উদাহরণ :

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধূলায় বসে খেলেছি এই তোমার দ্বারে।।
অবোধ আমি ছিলেম বলে যেমন খুশি
এলেম চলে,
ভয় করি নি তোমায় আমি অন্ধকারে।।

(পূজা / ২৯১)

অথবা

আমার আঁধার ভালো, আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।।

.....
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে সহজ মনে বিহার করে,
আভিমানী জ্ঞান তোমার বাহির দ্বারে
ঠেকে আসে।। (পূজা / ১৯৪)

বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা একত্রে বেছে নিয়েছি এই শব্দগুচ্ছগুলি : "নানা ছলে" "বিনা ভাষায়" "মুখের হাসি দিয়ে" "চোখের জলে"। "নানা ছলে" শব্দগুচ্ছটি বহুত্ব ও বৈচিত্রের ইঙ্গিতবাহী। এই নাম বলা শুধু একটি শব্দের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নয়। গভীর ব্যাকুলতায় উচ্চারিত সেই নাম ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে। এই শব্দগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে পরবর্তী "বিনা ভাষায়" শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে। নাম এখন আর "নানা ছলে" উচ্চারিত নির্দিষ্ট একটি শব্দ রইল না, সে আর কোন বিশেষ ভাষায় অন্তর্গত রইল না; ভাষার শৃঙ্খল থেকে ভাবের পূর্ণমুক্তি ঘটল। ভক্তহৃদয় ভাবপ্রকাশের চিরাচরিত মাধ্যমকে পরিহার করল --- যে মাধ্যম প্রাত্যহিক ব্যবহারে ধূলিমলিন, যার প্রকাশক্ষমতা সীমিত। ভাষার বন্ধনমুক্ত এই নাম আর কোন শব্দ নয়, কণ্ঠনিঃসৃত কোন ধ্বনি নয়, কোন বিশেষ রূপে সে আর সীমাবদ্ধ নয়। তার রূপ অসীম, অসংখ্য তার প্রকাশমাধ্যম, তার প্রকাশমাধ্যম শরীর মনের সকল অভিব্যক্তি। "চোখের জল" আর "মুখের হাসি" তার দুটি উদাহরণ মাত্র।

এরপর সঞ্চারী অংশ। এর পূর্ববর্তী অংশে আমরা দেখেছি "বলা" ক্রিয়ার একাধিপত্য। এমনকি "বলা" ক্রিয়ার কর্ম "নাম" শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে কেবলমাত্র প্রথম কলিতে। স্থায়ী ও অন্তরা অংশে গানটি আবর্তিত হয়েছে "বলা"কে কেন্দ্র করে। "বলব" ক্রিয়াপদের পৌনঃপৌনিক প্রত্যাগমন এক মন্ত্রোচ্চারণের রূপ

নেয়। এরপর সঞ্চারী অংশে আসার সময় ওই ক্রিয়াপদটিকে আবার ফিরে পাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে ওঠে; কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় না। প্রত্যাশিত "বলা" ক্রিয়ার পরিবর্তে আসে সমধর্মী "ডাকা" ক্রিয়াটি। লক্ষ্যণীয় তার ঠিক আগেই রয়েছে সমধাতুজ করণ "ডাকে"। বিশেষ্য "ডাকে" ও ক্রিয়া "ডাকব"র সহাবস্থান সেই ডাককে বহুগুণ তীব্র করে তোলে।

"বলা"র এই "ডাকা"য় রূপান্তরের তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য। সাধারণভাবে "বলা" ক্রিয়াতে বক্তব্যবিষয়েরই প্রাধান্য, "ডাকা" ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির। এক্ষেত্রে "ডাকব" ক্রিয়া প্রত্যাশা জাগায় কর্মরূপে আবির্ভাব ঘটবে তার যার "নাম" বলার ইচ্ছা পূর্ববর্তী অংশে বারংবার ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে "ডাকব" ক্রিয়ার প্রত্যাশিত কর্ম "তোমাকে"। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে পুনরাবির্ভূত হয় অন্তরালে চলে যাওয়া "তোমার নাম"। "তোমাকে"র স্থানে "তোমার নাম"এর এই আবির্ভাব "তুমি" ও "তোমার নাম"এর অভিন্নতার ইঙ্গিত দেয়। "তুমি"র প্রকাশ কেবল "তোমার নাম" এর মধ্য দিয়ে : "নাম" এর অন্তরালে বিলীন হয়ে গেছে "তুমি"র অস্তিত্ব।

এবার দেখা যাক এই "ডাক" এর উদ্দেশ্য কি। সঞ্চারীর শুরুতেই বলা হয়েছে কি কারণে এই ডাক নয়। এই ডাক "বিনা প্রয়োজনের ডাক" কোন লক্ষ্যপূরণের জন্য এই ডাক নয়। কোন বৈষয়িক লাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়, এমনকি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যও এই ডাক নয়। সম্পূর্ণ প্রত্যাশাবিহীন এই ডাক --- পূর্ববর্তী "বিনা আশায়" শব্দগুচ্ছটির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই ডাকে ঈশ্বর সাড়া দেবেন কিনা কোথাও সে প্রশ্ন তোলা হয় নি। এই সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে ষষ্ঠ কলিতে :

সেই ডাকে মোর শুধু - শুধুই পুরবে মনস্কাম
কেবলমাত্র "মনস্কাম" পূরণের লক্ষ্যেই এই ডাক। কিন্তু এই "মনস্কাম" কোন জাগতিক বা আধ্যাত্মিক চাহিদা নয়। এই মনস্কাম শুধুমাত্র সেই প্রিয়নাম বলার আনন্দ আস্বাদন। "পুরবে" ক্রিয়াপদের সঙ্গে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিশেষণীয় পদগুচ্ছ "শুধুই শুধু" ইঙ্গিত দিচ্ছে এই পূর্ণতাকে কোন বর্ণনীয় রূপ দেওয়া যায়না। এক্ষেত্রে সম্বন্ধপদ "মোর"এর প্রয়োগের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে সেই ধারণাই দৃঢ়তর হয়। "মোর" শব্দটি কোন বিশেষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা এই বাক্যের থেকে স্পষ্ট নয় : "ডাক" বা "মনস্কাম" যে কোনটিই হতে পারে।

"মোর সেই ডাক" ও "মোর মনস্কাম" দুটি শব্দগুচ্ছই সমান গ্রহণযোগ্য। "মোর" শব্দের প্রয়োগের এই দ্ব্যর্থবোধকতা "ডাক" ও "মনস্কাম"এর অভিন্নতার ইঙ্গিতবাহী। বলা যেতে পারে এই ডাকের পরম প্রাপ্তি ডাকার বা নাম বলার আনন্দটুকুই। সেই নিবিড় আনন্দ আবেশে বিভোর ভক্তপ্রাণ : তাই এই ডাকে ফল বা কি পরিণতি কি হতে পারে সেই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে যায়। মনে আসে "সেই তো আমি চাই" (পূজা / ১৯১) গানটির অন্তরা অংশ :

ফলের তরে নয় তো খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোঝা --- সমগ্র সঙ্গীতের মধ্যে এই ষষ্ঠ কলিটি ব্যতিক্রমী চরিত্রের। আমরা আগেই দেখেছি "বলা" বা "ডাকা"র সঙ্গে অর্থগতভাবে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত একমাত্র ক্রিয়াপদ "পুরবে" এই কলিতেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই ক্রিয়ার আর্থ বৈশিষ্ট্যি (semantic characteristic) নয়, এর রূপটিও লক্ষ্যণীয়। সামগ্রিকভাবে এই গানে ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিদিনের কথ্য ভাষা, চলিত গদ্য ভাষা। একমাত্র এই কলিতেই আমরা পাই ক্রিয়ার কাব্যরূপ ("পূর্ণ হবে"র পরিবর্তে "পুরবে")। সর্বনামের কাব্যরূপের প্রয়োগও এই কলিতেই দেখা যায় : "মোর"। এছাড়া এই কলিতে প্রযুক্ত বিশেষ্য "মনস্কাম" হল একমাত্র শব্দ যা গদ্যভাষায় ব্যবহৃত হয় না, যা পদ্যভাষার অন্তর্গত। এই কলির চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রথম পাঁচটি কলিতে ব্যক্ত হয়েছে ভক্তকবির সঙ্কল্প (প্রাণপ্রিয়ের নাম বলা

বা তাঁকে ডাকা); শেষ দুটি কলির সঙ্গে এই অংশের একটা যোগসূত্র রয়েছে; প্রথম অংশে প্রকাশিত ভাবনা শেষাংশে একটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য কলিটিতে ব্যক্ত হয়েছে সেই সঙ্কল্পের পরিণতি (মনস্কাম পূর্ণ হওয়া)। অন্যভাবে বললে ষষ্ঠ কলি বাদে সমগ্র গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে কবির চাওয়া আর ষষ্ঠ কলিতে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর পাওয়া। এই চাওয়া পাওয়ার বিভেদটুকু প্রতিফলিত হয়েছে দুই অংশের শব্দচয়ন ও ক্রিয়ারূপের পার্থক্যে।

গানের আভোগ অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা রয়েছে। আমরা জানি এই গানের পর্যায় পূজা। কিন্তু গীতবিতানে শ্রেণিবিন্যাস যাই হোক না কেন, বহু গানের ক্ষেত্রেই পূজা ও প্রেমের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই গানটির স্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারী অংশটুকু দেখে পাঠক এটিকে প্রেমসঙ্গীতরূপে অভিহিত করতেই পারেন। তেমন ব্যাখ্যা কোনভাবেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আভোগ অংশ পাঠ করা পর গানের পর্যায় সম্বন্ধে আর কোন অস্পষ্টতা থাকে না, দ্ব্যর্থবোধকতার কোন অবকাশ থাকে না। শিশু ও মায়ের সম্বন্ধের অবতারণার ফলে নিশ্চিত হয়ে যায় যে যাঁর নাম বলা হচ্ছে তিনি প্রেমাস্পদ বা প্রেমাস্পদা হতে পারেন না (যদি প্রেম বলতে আমরা নরনারীর প্রেম বুঝি)।

এই অংশে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম অংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির প্রত্যাবর্তন। পূর্ববর্তী কলিতে অনুপস্থিতির পর সপ্তম কলিতে আবার ফিরে আসে ক্রিয়া "ডাকা"। একই কলিতে অনুপস্থিতির পর আবার সপ্তম ও অষ্টম কলিতে ফিরে আসে বিশেষ্য "নাম"। পরপর তিনটি কলিতে অনুপস্থিতির পর শেষ কলিতে ফিরে আসে ক্রিয়া "বলা" : এই কলির শুরুতেই অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ "বলতে" আর কলির শেষে সমাপিকা রূপ "বলে"। সাময়িক অনুপস্থিতির পর আবার "নাম" ও "বলা"র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

ক্রিয়ার কালরূপগুলিও পর্যালোচনাযোগ্য। স্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারী অংশে "বলা" এবং "ডাকা" দুটি ক্রিয়ারই কালরূপ ভবিষ্যৎ (ডাকব/বলব)। শেষ দুটি কলিতে এই ক্রিয়াদুটিরই সাধারণ বর্তমানরূপ ব্যবহৃত হয়েছে (ডাকে/বলে)। যে গানের সূচনা হয়েছিল ভবিষ্যৎ সঙ্কল্প দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে এক চিরন্তন সত্যে।

এই দুটি কলির শুরুতে ও শেষে মা ও শিশু ("শিশু যেমন মাকে" "মায়ের নাম সে বলে")। যেন দৃশ্যপটের সবটুকু জুড়ে আছে মা ও শিশুর নিবিড় বাহুবন্ধন।

মাঝে রয়েছে "নামের নেশায়" ও "এই সুখেতেই"। পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র রয়েছে।

বাস্তব সত্য এটাই যে শিশুর মাকে ডাকার কারণ জৈবিক প্রয়োজন। যখন সে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বোধ করে, যখন সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, তখনই সে ডাকে মাকে। একে "বিনা প্রয়োজনের ডাক" বা "বিনা আশার ডাক" বলা চলে না। মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ বা তার সান্নিধ্যলাভের কারণেই এই ডাক। কিন্তু শিশুর সেই ডাকের মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করা কবির উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কাছে এই ডাকের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কোন মূল্য নেই : এই ডাকটির নান্দনিক দিকটিই শুধু কবিকে আকর্ষণ করে। বারবার অস্ফুট কলস্বরে মার উদ্দেশে এই ডাক কবির মুগ্ধভাবনায় প্রতিভাত হয় "নামের নেশা" রূপে। তার পরম প্রাপ্তি যেন নাম বলার আনন্দটুকুই --- যা গানের ষষ্ঠ কলিটিতেই স্মরণ করিয়ে দেয় : সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পূরবে মনস্কাম।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য শিশুর মুখে কিন্তু "মা" শব্দটি বসানো হয় নি। সে বলে "মায়ের নাম"। এই গানের শুরু "তোমার নাম" দিয়ে আর শেষ "মায়ের নাম" দিয়ে। যেমন "তুমি" "তোমার

নাম" এর অন্তরালে বিলীন হয়ে গেছে, "মা"কে তেমনি ছাপিয়ে গেছে "মায়ের নাম"। নামময়তার আর একটি দৃষ্টান্ত।

যে শিশুর মুখে ভাষা ফোটে নি সেও কিন্তু মাকে ডাকে নানা ভঙ্গীতে, নানা ছলে --- "মুখের হাসি দিয়ে", "চোখের জলে"। ভাষাহীন ডাকের একটি দৃষ্টান্ত।

এবার দেখা যাক এই গানের ঐতিহ্যের প্রভাব কতখানি এবং রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা কোনখানে। এই গানের আভোগ অংশের বিষয়বস্তুর উপর রামপ্রসাদী গান বা শ্যামাসঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধকে মা ও শিশুর সম্পর্করূপে কল্পনা সেই পরম্পরারই অন্তর্গত। আমরা দেখব মাতৃপদে নিবেদিতপ্রাণ কালীসাধকের আকুল 'মা' ডাকের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য গানে ভক্তকবির ডাকের সাদৃশ্য আর পার্থক্য কোথায়।

মাতৃসাধকের "মা" ডাক অবশ্যই "বিনা প্রয়োজনের" ডাক --- যদি প্রয়োজন বলতে জাগতিক প্রয়োজন বোঝানো হয়। বলাই বাহুল্য শাক্তকবির কালীনাম বলার উদ্দেশ্য বৈষয়িক সম্পদলাভ, গার্হস্থ্যজীবনে সুখশান্তিলাভ, কর্মজীবনে সাফল্যলাভ ইত্যাদি বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতটিও সেই ধারণারই অনুসারী। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কালীসাধক কালীনাম করেন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, উপাস্য দেবীর কৃপালাভের জন্য, আরও সহজভাবে বললে মাকে পাবার জন্য। এক্ষেত্রে পার্থিব প্রয়োজন না থাকলেও একটা প্রয়োজন আছে, এই প্রয়োজন আধ্যাত্মিক। আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন হল সম্পূর্ণভাবেই নান্দনিক। শুধুমাত্র নাম বলার অনির্বচনীয় আনন্দটুকু আস্বাদন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অন্যদিকে কালীনাম কালীসাধকের কাছে যতই মধুময় হোক, নামের মাধুর্য তাকে যতই আবেশবিহ্বল করে তুলুক না কেন, তাঁর নাম বলা কখনই শুধুমাত্র নাম বলার আনন্দে নয়। এই নাম বলা কখনই তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্য নয়, তা তাঁর লক্ষ্যপূরণের মাধ্যমমাত্র।

কালীসাধকের "মা" ডাক কোনভাবেই "বিনা আশা"র ডাক নয়। পূর্ববর্তী বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেই বলতে হয় মাকে পাবার আশাতেই তাঁর এই ডাক। কখনও কখনও তাঁর গানে দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা ফুটে ওঠে, ইষ্টদেবীর বিরুদ্ধে তিনি হৃদয়হীনতার অভিযোগ করেন। কখনও আবার একাগ্রচিত্তে মাকে ডাকতে পারছেন না এই কথা ভেবে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হন। বৈষয়িক সুখের প্রত্যাশা না থাকলেও ভিন্নতর প্রত্যাশা আছে : প্রত্যাশার প্রকৃতি যাই হোক না কেন এই ডাক কখনই প্রত্যাশাবিহীন নয়।

কালীসাধকের "মা" ডাক কোনভাবেই "বিনা ভাষা'র ডাক নয়। শাক্তকবি অনেকক্ষেত্রে অকপটে স্বীকার করেন তিনি সাধন ভজন কিছুই জানেন না, সমস্ত আচার অনুষ্ঠান, পূজার উপাচার পরিহার করে তিনি "মা" ডাককেই তার সাধনার একমাত্র সম্বল করে নিয়েছেন। তাঁর প্রর্থনা তিনি যেন অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়ে মাকে ডাকতে পারেন। এক্ষেত্রে নাম বলার মাধ্যম কি হবে সেই প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। মাতৃসাধকের একমাত্র বিবেচ্য ডাকের মুহূর্তে নিজের ভক্তির গভীরতা। নাম বলার জন্য ভাষাকে বর্জন করে ভিন্নতর প্রকাশমাধ্যমের সন্ধান --- "মুখের হাসি" "চোখের জল" কে প্রকাশমাধ্যম করে নেওয়া --- এই সমস্ত ভাবনা একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। নাম বলার এই নান্দনিক দিকটি শ্যামাসঙ্গীতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুতরাং বলা যায় "বলব বিনা ভাষায় বলব বিনা আশায়" এই কলিটিতেই রবীন্দ্রভাবনার মৌলিকত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

এবার আমরা দেখব যে সমস্ত পূজা পর্যায়ের গানে নামের প্রাধান্য তার মধ্যে আমাদের আলোচ্য গানটির স্থান কোথায়। আমরা বেছে নিয়েছি পূজা পর্যায়ের সেই সব গান যেখানে "তোমার নাম" শব্দগুচ্ছটি একাধিকারবার প্রযুক্ত

হয়েছে। আমাদের আলোচ্য গানটি বাদ দিলে তেমন সংখ্যা চার।

১। তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
পুণ্যপ্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল
হৃদয়শতদলদলরাজি।।
তোমারি নামে নিবিড়তিমিরে ফুটিল
কনকলেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে
কিরণবীনা বাজি।।
তোমারি নামে পূর্বতোরণে খুলিল
সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবনসাগরে জাগিল লহরীলীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল
সাজি।। (পূজা / ৫০৫)

২। আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
তোমারি নামে সকল তারার মাঝে।।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁইয়ে
কখন আমার ললাট দিয়ে ছুঁইয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে ---
আপন আমার আপনি মরে লাজে।।
মন মিলিয়ে যায় আজ ওই নীরব রাতে
তারায়-ভরা ওই গগনের সাথে।
অমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক-না **নামময়,**
আঁধারে মোর তোমার আলোর
জয় গভীর হয়ে থাক্ জীবনের কাজে।।
(পূজা/ ৩৫০)

৩। কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার **অমৃতনামে**।।
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, কেমনে রটিব
তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ তোমার মধুর প্রেমে।।
তব নাম লয়ে চন্দ্রতারা অসীম শূন্যে ধাইছে ---
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে
গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীলশতদল
তোমার কিরণে সদা ঢলঢল,
তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে।।
(পূজা / ৩০৪)

৪। আমার মুখের কথা **তোমার**
নামে দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় **তোমার**
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারায় ছন্দে আমার
দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে **তোমার**
নামেরই ঝঙ্কার।
ঘুমের' পরে জেগে থাকুক
নামের তারা **তব,**
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় **তোমার**
নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় **তোমার**
নামটি রহুক লিখা।।
সকল কাজের শেষে **তোমার**
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে **তোমার**
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।।

আমাদের আলোচ্য গানটির সঙ্গে উল্লিখিত গানগুলির প্রথম পার্থক্য আলোচ্য গানের ভাষা দৈনন্দিন জীবনের ভাববিনময়ের ভাষা, একান্তভাবেই মুখের ভাষা। সে ভাষা চলিত গদ্যের ভাষা, সে ভাষা সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত ভাষা। আমরা দেখেছি আমাদের গানে একমাত্র ষষ্ঠ কলিতেই কাব্যধর্মী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে

("মোর" "পুরবে" ও "মনস্কাম")। গানের কোথাও ক্রিয়া বা সর্বনামের সাধুরূপ প্রযুক্ত হয় নি। শব্দচয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোথাও প্রাত্যাহিক কথোপকথনে অব্যবহৃত গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ প্রয়োগ করা হয় নি। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ নেই; সমাসবদ্ধ পদ এই গানে মাত্র দুটি : "ছায়াতল" ও "মনস্কাম"। একমাত্র আলঙ্কারিক প্রয়োগ "মনের ছায়াতলে"।

পক্ষান্তরে অন্যান্য গানগুলির ভাষা পরিশীলিত, সেই ভাষা কাব্যের ভাষা। সব গানেই লক্ষ্য করা যায় তৎসম শব্দের আধিক্য --- যে সমস্ত শব্দ মার্জিত সাহিত্যভাষার অন্তর্গত। প্রথম ও চতুর্থ গানে চোখে পড়ে সমাসবদ্ধ পদের আধিক্য (পুণ্যপ্রভাত, কনকলেখা, কিরণবীনা, জীবনসাগর, লহরীলীলা, রক্তধারা, দেহবীণা, জীবনপদ্ম)। প্রথম ও তৃতীয় গানে দেখা যায় ক্রিয়ার সাধুরূপ ও কাব্যরূপের আধিক্য। উল্লেখ্য কোন গানেই কিন্তু "নাম" "বলা" ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত হয় নি। দ্বিতীয় গানে শব্দটি "বাজা" ক্রিয়ার কর্তা, শেষ গানেও এটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে "বাজা" ক্রিয়ার কর্মরূপে (এক্ষেত্রে অবশ্য কর্ম "নাম" নয় "নামের ঝঙ্কার")। বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় এই গানগুলির কোনটিরই ভাষা আমাদের আলোচ্য গানের মতো সরল, নিরলঙ্কার নয়।

ভাষাগত এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপকল্পনায় দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। আমরা আগেই দেখেছি আলোচ্য গানটিতে ঈশ্বর নিভৃত প্রাণের দেবতা, তিনি একান্তভাবেই ভক্তের। এখানে তৃতীয় কোন উপস্থিতি নেই। এই গানে নিসর্গ জগতের কোন চিত্রকল্প নেইঃ বহির্জগৎ যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ভক্তকবি ঈশ্বরকে ডাকতে চান মায়ের প্রতি শিশুর নির্ভরতা নিয়ে। গানের ভাষার এই সহজ নিরলঙ্কার রূপটি সেই শিশুহৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে নামপ্রধান গানগুলির প্রথম তিনটিতে (চতুর্থ গানটির আলোচনা আমরা পরে করছি) ঈশ্বর প্রতিভাত হন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভুরূপে, ভক্তপ্রাণের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় আমরা তাকে পাই না। আমরা দেখি তাঁর নামের এক মহিমান্বিত রূপ। সে নাম ধ্বনিত হয় নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে। এই গানগুলিতে আমরা দেখি নানা বিচিত্র নৈসর্গিক, মহাজাগতিক চিত্রকল্প। প্রথম গানটিতে দেখা যায় প্রভাতসৌন্দর্যের মধ্যেই সেই নামের প্রকাশ। দ্বিতীয় গানে নৈশ সৌন্দর্যের মনোরম আবহ রয়েছে। তৃতীয় গানে সেই নামের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে মানবসংসার থেকে নিসর্গসংসারে, চরাচরব্যাপী সৌন্দর্যের মাঝে। ঈশ্বর বা তাঁর নামের এই মহিমামণ্ডিত রূপের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এই গানগুলির ভাষা, এবং রূপকল্পের বৈচিত্র্য।

উপরোক্ত তিনটি গানের সঙ্গে শেষ গানটির সাদৃশ্য পরিশীলিত ভাষা ও বৈচিত্র্যময় রূপকল্পের ব্যবহারে। কিন্তু পার্থক্য অন্যত্র। আমাদের আলোচ্য গানটির মতো এই গানটিতেও তৃতীয় কোন উপস্থিতি নেই। এই গানেও আমরা দেখি "আমি-তুমি"র নিবিড় অন্তরঙ্গতা। আমাদের আলোচ্য গানে আমরা দেখি এক শিশুহৃদয়ের প্রতিচ্ছবি আর শেষোক্ত গানটিতে আমরা শুনি এক মুগ্ধ কবির কণ্ঠস্বর --- যিনি সেই প্রিয়নামের মাধুর্য আস্বদান করেন জীবনের ব্যাপ্তিতে, তার বৈচিত্র্যে। এই গানটিতে বিপরীতের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় --- নামের সৌন্দর্যের প্রকাশ কথায় নীরবতায়, নিদ্রায় জাগরণে, হাসি কান্নায়, জীবনে মরণে। এইখানে "প্রভু আমার প্রিয় আমার" (পুজা / ৬৮) গানটির আভোগ অংশটি স্মরণ করা যেতে পারে :

ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে
বিহার ---
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।।

আমাদের আলোচ্য গানে এবং শেষোক্ত গানটিতে তিনি "আমার" এবং তার বিহার

"চিত্তে", অন্য গানগুলিতে তিনি সবার ও তার বিহার "বিশ্বে"।

দেখা গেল নামপ্রধান গানগুলির মধ্যে আমাদের আলোচ্য গানটির একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে।

নামে কি এসে যায়? What's there in a name? একথা যেমন সত্যি যে গোলাপকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন তাতে তার সৌরভমাধুর্যের কোন তারতম্য ঘটে না, বা শ্রাবণের মেঘকে চঞ্চল নাম দিলে তার জল অপবিত্র হয়ে যায় না, আবার একথাও সমান অনস্বীকার্য যে জীবনের বহুক্ষেত্রেই নামের গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

আমাদের গানের আলোচনার সময়েই আমরা উল্লেখ করেছি সাধকের কাছে আরাধ্য দেবতার নামের গুরুত্ব কতখানি। শুধু সাধক বা ভক্ত নয়, ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রয়োজন যাই থাক দেবতাকে প্রসন্ন করার সহজতম পন্থা হল ভক্তিভরে তাঁর নাম বলা (নাম জপ বা নাম সঙ্কীর্তন করা)। পুণ্যনাম উচ্চারণে যেমন পরিত্রাণ মেলে, অশুভ নাম উচ্চারণে তেমনি বিপর্যয় নেমে আসে। সকালে কৃপণ লোকের নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, তেমনি রাত্রে ভূতপ্রেত বা সাপের নাম করলে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। অপদেবতা বা সাপের প্রসঙ্গ তোলায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, নিষেধাজ্ঞা তাদের নাম উচ্চারণে, নির্দিষ্ট শব্দের প্রয়োগে। তাই "ভূত" শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম "তেনারা" বা "রাতবিরেতে নাম করতে নেই" বাক্যাংশটির ব্যবহার বা "সাপ"এর পরিবর্তে "লতা"র প্রয়োগ। তবু রাতে ভুলবশতঃ সাপের নাম করে ফেললে আস্তিকমুনির নাম উচ্চারণের মাধ্যমেই দোষ কাটানো যায়। আবার মন্ত্রতন্ত্র জানা না থাকলেও শুধুমাত্র রামনামের জোরে অপদেবতার হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে। তবে পুণ্যনাম উচ্চারণে পাপীতাপী পরিত্রাণ লাভ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সেই নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় --- যেমন ঘটেছিল দস্যু রত্নাকরের ক্ষেত্রে।

কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী বা সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছেই নামের গুরুত্ব এমন নয়। অধ্যাত্মজীবনের বাইরে, অলৌকিক চিন্তাভাবনার জগতের বাইরে দৈনন্দিন সামাজিক জীবনেও নাম সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের নিজের নাম ঘিরে আত্মমর্যাদাবোধ বা কখনও কখনও আত্মগরিমার অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। তাই কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে বা ভীতিপ্রদর্শন করতে হলে প্রায়শঃ বলা হয়ে থাকে : "আমার নামও অমুক ....."। নাম তখন পদমর্যাদার সমতুল্য হয়ে উঠে। তবে শুধুমাত্র উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরাই যে এমন কথা বলে থাকেন তা নয়, নিতান্ত যোগ্যতা বা ক্ষমতা সম্বন্ধে তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। একই পরিস্থিতিতে কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে : "যদি এটা না পারি তো আমার নাম অমুক নয়" --- যা প্রমাণ করে নামে কিছু এসে যায়। নাম যদি একটা তাৎপর্যহীন শব্দ হত তবে নিজের আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ দিতে কেউ বলত না : "যদি এটা না হয় তো আমার নামে কুকুর পুষো"। একই নামে একটি গৃহপালিত জীব থাকলে তাতে ক্ষতি কী? কুকুরের একই নামে নামকরণ হলে সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তিটির অর্থসম্পদ বা পদমর্যাদার তো কোন তারতম্য ঘটছে না। আবার একইভাবে বলা চলে নামের কোন গুরুত্ব না থাকলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলেও তাই নিয়ে এত ব্যঙ্গবিদ্রূপ হত না।

কাব্যে নামের গুরুত্বের কথা বললে বৈষ্ণব পদাবলীর কথা মনে আসে। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের রূপ দর্শনে নয়, এমন কি বংশীধ্বনিতেও নয়, শুধুমাত্র নামশ্রবনেই কৃষ্ণপ্রেমে মোহিত! নামের এমন মহিমা জানার পরও কি বলা যায় নামে কিছু যায় আসে না?

এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। নামের গুরুত্ব বা গুরুত্বহীনতা নিয়ে স্বতন্ত্র নিবন্ধ লেখা যায় স্বতন্ত্র গবেষণাও চলতে পারে। কিন্তু এখানে

সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই আলোচনা থেকে যা স্পষ্ট এবং আমাদের পক্ষে যা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে নাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুটি সম্পুর্ণ বিপরীত মনোভাব দেখা যায়। যে রবীন্দ্রনাথ "চণ্ডালিকা"র উল্লিখিত গানটিতে নামকে কোনপ্রকার গুরুত্ব দিতে সম্মত নন, তিনিই আবার নামকে, শুধুমাত্র নামকে একাধিক গানের বিষয়বস্তু করে নিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায় "চণ্ডালিকা"র গানে নাম সম্বন্ধে প্রকাশিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবেই শেকসপীয়রের মতো; কিন্তু "একদিন শতবর্ষ আগে" শেকসপীয়রেরই দেশে রচিত গানে নাম সম্বন্ধে শেকসপীয়রের বিপরীত ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে (উল্লেখ্য আমাদের আলোচ্য গানটির রচনাকাল ১৯১৩ এবং স্থান লন্ডন)। নাম প্রসঙ্গে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের একটি দিক উন্মোচিত করে।

গ্রন্থপুঞ্জী :

খাতুন সন্‌জীদা, *রবীন্দ্রসঙ্গীত : মননে লালনে,* ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ১৯১১

চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, *রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,* কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৩

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *অখণ্ড গীতবিতান,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৪১

মুখোপাধ্যায় প্রভাতকমার, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী,* কলকাতা, টেগোর রিচার্স ইনস্টিটিউট, ২০০৩

রায় আলপনা (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ-অনুষঙ্গ,* কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১

রুদ্র সুব্রত (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা,* কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০

সহযোগী অধ্যাপক (ফরাসী) এবং প্রধান, বিদেশী ভাষা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ